স্বামী প্রেমঘনানন্দ

(জীবন আলেখ্য)

সংকলন ও সম্পাদনা
স্বামী সোমানন্দ

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

''সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ।।''

প্রকাশক ঃ সম্পাদক
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
রিশড়া, হুগলী, পঃ বঃ

প্রকাশক ঃ
স্বামী শিবেশানন্দ
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
রিশড়া, হুগলী- ৭১২ ২৪৮

পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ
আষাঢ় ,১৪৩১

প্রাপ্তিস্থান
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম মঠ
৪০, রামকৃষ্ণ রোড, রিশড়া,
হুগলী, পিন-৭১২২৪৮
চলভাষ ঃ
৯৪৩২২ ১৩৫৮৫
৯৪৩৩২ ১৫০৬৫

বিনিময় মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে
সোমনাথ ব্যানার্জী
মাহেশ, শ্রীরামপুর, হুগলী

আশ্রমের প্রতীক

স্বামী প্রেমঘনানন্দ মহারাজ এই প্রতীক চিহ্ন মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন। প্রথমে এটি কিশোর বাংলার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পরে আশ্রম স্থাপনার সূচনা থেকে আশ্রমের প্রতীক রূপে এটি গৃহীত হয়।

ঃ প্রতীকের মর্মার্থ ঃ

দুটি ত্রিভুজ (ষট্‌কোণ) - শক্তির প্রতীক (তন্ত্রে ব্যবহৃত)।
প্রস্ফুটিত পদ্ম - জ্ঞানের প্রতীক ।
শক্তি চাই সবার আগে। শক্তিমানেরই জয় হয়।
দেহের শক্তি, মনের শক্তি এবং আত্মিক শক্তি বিকাশের
পথে সাহায্যকারী হবে এ আশ্রম। পরিপূর্ণ শক্তি বিকশিত
হলে হৃদ্‌পদ্ম প্রস্ফুটিত হবে ধীরে ধীরে। তখন জ্ঞান
লাভ হবে - এই জ্ঞানলাভই জীবনের উদ্দেশ্য।

আশীর্বাণী - শ্রীরামকৃষ্ণ

ছোকরাদের অত ভালবাসি কেন, জান?
ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয় -
ঠাকুর সেবায় চলে।

জোলো দুধ অনেক জাল দিতে হয় -
অনেক কাঠ পুড়ে যায়।

ছোকরারা যেন নূতন হাঁড়ি-পাত্র
ভাল-দুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়। তাদের
জ্ঞান-উপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয়। বিষয়ী
লোকদের শীঘ্র হয় না। দই-পাতা হাঁড়িতে
দুধ রাখতে ভয় হয়, পাছে নষ্ট হয়।

আশীর্বাণী - শ্রীশ্রীমা

যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগতকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগত তোমার।

এত জপ করলামই বল, আর এত কাজ করলামই বল, কিছুই কিছু নয়। মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার কি সাধ্য। হে জীব শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবে তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।

পূজা জপ ধ্যান এ সব করতে হয়। যেমন ফুল নাড়াতে নাড়াতে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘসতে ঘসতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে জ্ঞানের উদয় হয়।

সংসারে থাকতে গেলে কেমন করে থাকতে হয় জান? যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন ।

আশীর্বাণী - স্বামী বিবেকানন্দ

হে বীর হৃদয় বালকগণ, কাজে এগিয়ে যাও। টাকা থাক বা না থাক মানুষের সহায়তা পাও আর নাই পাও, তোমার তো প্রেম আছে ? ভগবান তো তোমার সহায় আছেন ? অগ্রসর হও, তোমার গতি কেউ রোধ করতে পারবে না।

কাজের সামান্য আরম্ভ দেখে ভয় পেয়ো না, কাজ সামান্য থেকেই বড় হয়। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হতে যেয়ো না, সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব প্রবৃত্তি জীবন সমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবিয়েছে। এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও অর্থাৎ মৃত্যুকে পর্যন্ত তুচ্ছ করে নিঃস্বার্থ হও এবং কাজ কর।

হে বীর হৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছ। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে ভয় পেয়ো না - এমন কি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেয়ো না- খাড়া হয়ে ওঠো, ওঠো, কাজ কর।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমার ভেতরে যে আগুন জ্বলছে তা তোমাদের ভেতর জ্বলে উঠুক, তোমাদের মনমুখ এক হোক, ভাবের ঘরে চুরি যেন একদম না থাকে। তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মরতে পারো- সব সময় বিবেকানন্দের এই প্রার্থনা।

আশীর্বাণী - স্বামী শিবানন্দ

বাবা তোমরা ধন্য যে শ্রীরামকৃষ্ণকে তোমাদের জীবনের আদর্শ করেছ। তিনিই এ যুগের অবতার। যে তারে শরণাপন্ন হবে, তারই কল্যাণ হবে। আমি খুব আশীর্বাদ করছি। তোমরা শক্তিলাভ কর, ধন্য হয়ে যাও। মানবজীবন সার্থক হোক তোমাদের। আর যে বাবা, আলোকের কথা বললে 'আমাদের একটু আলোক দান করুন, আপনি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ।' সে আলোক আসবে ভেতর থেকে। যত ভেতরে যাবার চেষ্টা করবে, যত অন্তর হতে অন্তরতম প্রদেশ প্রবেশ করবে, ততই আলোক দেখতে পাবে। আলোক বাইরে কোথাও নেই। সব ভেতরে, ভেতরে। সেই আলোকরূপিনী মা সকলের ভেতরেই আছেন।

মার শরণাগত হও, ব্যাকুল হয়ে বালকের মতো কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা কর। আমি খুব আন্তরিক আশীর্বাদ করছি, যাতে তোমাদের প্রাণে শান্তি আসে। আর সেই শান্তিধামে পৌঁছবার রাস্তাও তোমাদের বলে দিলাম। কিন্তু সব করতে হবে তোমাদের। বাইরে থেকে আসবে কেবল Suggestion, উদ্দীপন। আর বাকী সব নিজেকেই করে নিতে হয়। গুরুশক্তিটা হল সেই উদ্দীপন। Suggestion, যত তাঁর দিকে এগুবে ততই রাস্তা পরিষ্কার দেখতে পাবে।

অখন্ডমন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

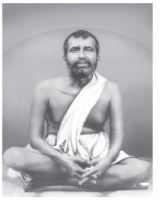

“ মঙ্গলং গুরুদেবায় দেব্যৈ মাত্রে চ মঙ্গলম্ ।
মঙ্গলং ভক্তবৃন্দেভ্যঃ সর্বলোকায় মঙ্গলম্”।।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ (অরূপ) মহারাজের অমৃতবাণী

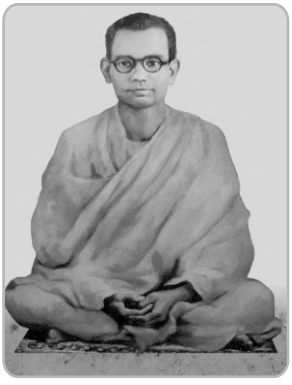

১। মনে সর্বদা বিচার কর, সহ্যগুণ বাড়াও, আর সকলকে ভালবাস। দেখবে আপনা আপনি তোমার রাগ কমতে আরম্ভ হয়েছে। বন্ধুকে প্রাণ দিয়ে ভালবাস, তার গুণ দেখ , সকলের কাছে তার গুণ বল , আর সমস্ত মন দিয়ে কামনা কর বন্ধুকে সবাই ভালবাসুক, সম্মান দিক, দেখবে হিংসে আপনা আপনি কোথায় পালিয়ে গেছে

২। নিজের আরামের জন্য কখনও ব্যস্ত হয়ো না। পরের, দশজনের উপকারের জন্যে ব্যস্ত হও। ভদ্র হও, সভ্য হও। মহৎ হবার কামনা কর। নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। উন্নতি আপনা আপনিই হবে। মনের মন্দ কমবে , ভাল বাড়বে ।

৩। বড় হবার ভাল হবার কামনা করে যে আন্তরিকভাবে কাজে এগিয়ে যায়, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে তার গতিরোধ করতে পারে । উৎসাহী হও, কর্মশীল হও, জয় তোমার হবেই হবে ।

৪। আমাদের মন অস্থির আর সব সময়ই নিজের অভাব অভিযোগ নিয়ে ব্যস্ত। এ জন্যেই পরমশক্তির স্রোত আমাদের ভেতর সাড়া জাগাতে পারছে না। ধ্যান অভ্যাসের দ্বারা আমাদের মন যত শান্ত হবে, ততই আমাদের মনে সেই পরমশক্তির ধারা প্রবেশ করবে। আমাদের মন বিশেষ শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠবে ।

৫। মনে অহংকার এলে বড় হবার কামনা বাড়াও। যারা তোমার চাইতেও বড় তাদের ওপর নজর রাখ। আত্মবিশ্বাসী হও। সত্যিকার গুণী হবার চেষ্টা কর ।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ
।। জীবন-আলেখ্য ।।

পরিচয় - শ্রীহট্ট জেলার (বর্তমান বাংলাদেশ) ইটা পরগণার অন্তর্গত ভুমিউড়া গ্রামে (ডাকঘর-পাঁচগাঁও) বাংলা ১৩০৯ সালের ২ ভাদ্র ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে (ইং ১৯০২ সালের আগস্ট মাস) গিরীন্দ্রকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যাভূষণ এবং মাতা সরোজিনী দেবী। পিতা সর্বজনপূজ্য নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার, সামান্য জমিজমা আর যজমানী কয়েক ঘর-এই নিয়ে কষ্টে চালাতে হয় সংসার। গিরীন জ্যেষ্ঠপুত্র, তার তার পরে আরও তিন ভাই, তাঁর বড় দুই দিদি ও ছোট দুই বোন।

পড়াশুনা - প্রথমে গ্রামে শরত মোক্তারের পাঠশালায় ও পরে পাঁচগাঁও কমলচরণ মধ্য ইংরেজী স্কুলে চার বছর। তারপর বিয়ানীবাজার হাই স্কুলে ৭ম শ্রেণী এবং শিলচর নরসিংহ হাইস্কুলে ৮ম, ৯ম শ্রেণী ও ১০ম শ্রেণী । ১৯২১ সাল মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন - সেই আহ্বানে গিরীন্দ্র কুমার স্কুল থেকে বেরিয়ে এলেন, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা আর দেওয়া হয়নি। মেধাবী বুদ্ধিমান ক্লাসের সেরা ছাত্র-এখানেই তাঁর আনুষ্ঠানিক পড়াশুনা শেষ হয়ে গেল।

এছাড়া গান বাজনা, মূর্তিগড়া, ছবি আঁকায় তাঁর গুণের প্রকাশ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার ফলে পুলিশী নিগ্রহের আশংকায় তাঁকে নিয়ে আসা হল কলকাতায়, তাঁর মামা শিল্পী কুমুদনাথ ভট্টাচার্যের কাছে। তিনি গিরীন্দ্রকুমারকে নিয়ে গেলেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের নিকটে। অবনীন্দ্রনাথের আর্ট স্কুলে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হল। অল্পদিনেই গিরীন্দ্রকুমার তাঁর প্রিয় ছাত্র হলেন। অবনীন্দ্রনাথ খুব ভাল এস্রাজ বাজাতেন। আচার্যের সঙ্গে থেকে গিরীন্দ্রকুমারও এই বাজনাটি আয়ত্ত করে নিলেন। প্রয়োজন হলে তবলায় ঠেকাও দিতেন। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আজীবন যোগাযোগ ছিল। ১৯২৩ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় দু বছর কলকাতা থাকাকালীন সময়ে তিনি মাঝে মাঝে বেলুড় মঠেও যেতেন।

এর আগে শিলচরে ছাত্রাবস্থায় ওখানকার রামকৃষ্ণ আশ্রমে কিছুকাল ছিলেন। ইতিমধ্যে সুযোগমত বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট থেকে তিনি মন্ত্র দীক্ষা লাভ করেন।

বেলুড় মঠ - দেশে ফিরে গিয়ে ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি শিলচর আশ্রমে যোগ দেন। ব্রহ্মচারী গিরীন্দ্রের চেষ্টায় আশ্রমের নিজস্ব একখণ্ড বিস্তৃত জমি হয় এবং ঘরবাড়ি তৈরী হয়। এই শিলচর আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মচারী গিরীন্দ্র কুমার। ১৯২৭ সালে বেলুড় মঠের আহ্বান আসে তাঁর ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান। এবার নাম হয় ব্রহ্মচারী স্বরূপচৈতন্য। গুরু স্বামী শিবানন্দ মহারাজ।

১৯৩০ সালে তাঁর সন্ন্যাস সংস্কার লাভ হয়। সন্ন্যাস গুরু স্বামী শিবানন্দ মহারাজ এবার নাম দিলেন স্বামী প্রেমঘনানন্দ। তিনি ১৯৪১ এর মধ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কয়েকটি কেন্দ্রে ছিলেন, তন্মধ্যে আছে; দেওঘর বিদ্যাপীঠ, বেলুড় মঠ, ময়মনসিংহ আশ্রম, পুরী রামকৃষ্ণ মঠ, উদ্বোধন কার্যালয়। সম্ভবত ১৯৩৭ থেকে উদ্বোধনে তিনি সহকারী সম্পাদক রূপে যোগদান করেন। ১৯৩৬ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবার্ষিক উৎসবে তিনি নানা স্থানে বক্তারূপে প্রেরিত হয়েছিলেন।

সাধুজীবনে যাদের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অশোকানন্দ, স্বামী প্রেমেশানন্দ স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী আত্মবোধানন্দ, মহেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই)। তাঁর বাল্য সহপাঠী, যাঁরা পরে বেলুড় মঠে যোগদান করেন, তাঁরা হলেন - স্বামী সাধনানন্দ, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ!

বেলুড় মঠের উদ্বোধন কেন্দ্র থেকে ১৯৪১ সালে তিনি সরে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ৩৯ বৎসর। তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে পদত্যাগ করেন ১৯৪৩ সালে এবং তা গৃহীত হয় ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে। তার পূর্বে তাঁকে বার বার মঠে ফিরে যাবার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিছুদিন থেকেই শিশু ও কিশোরদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের মানুষ গড়ার ও দেশপ্রেমের প্রেরণা জাগাবার একটি তীব্র তাগিদ অনুভব করছিলেন। বেলুড় মঠ থেকে প্রাপ্ত তাঁর মঠ-জীবনের বিবরণের অনুলিপি দেওয়া হল

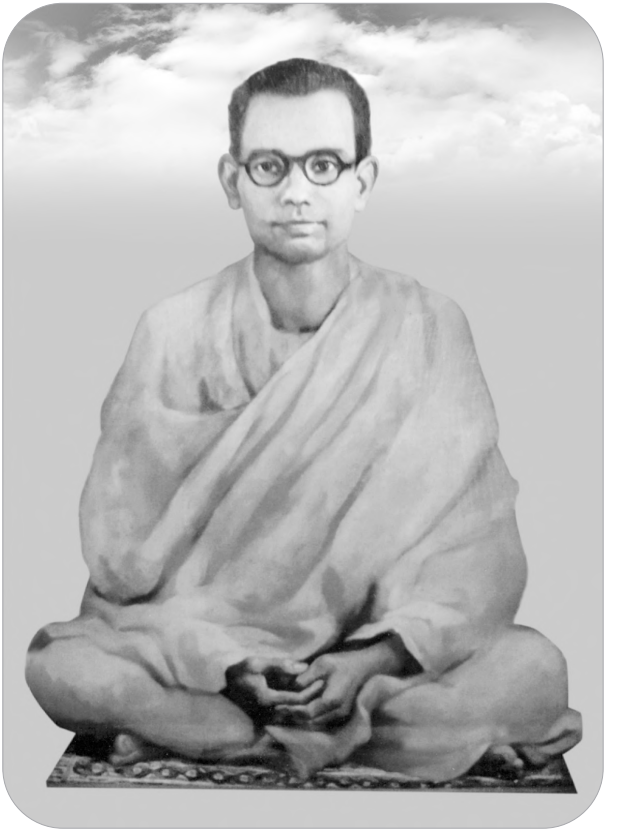

জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব কী জয়।।
জয় মা সারদাদেবী কী জয়।।
জয় স্বামী বিবেকানন্দজী কী জয়।।
জয় শ্রী গুরু মহারাজজী কী জয়।।

(True Copy)

Sri Ramakrishna Math
P. O. Belurmath,
Dt. Howrah,
20th August, 1950.

Re: Swami Premghanananda

On searches the following appears from the records of the Belur Math about Swami Premghanananda, late of the Ramakrishna Order.

Name and address before initiation : Girindra Chakravarty,
Vill. Bhuniura,
P. O. Panchgaon,
Dt. Sylhet.

Education: Non-matriculate

January, 1924 -	He joined the Silchar Centre of the Ramakrishna Math.
March, 1927 -	He was initiated as a Brahmachari of the Order and was given the name of Swarup Chaitanya.
March, 1930 -	He was ordained as a monk of the Order and was conferred the name of Swami Premghananda.
March, 1941 -	He lived separately and independently and severed all connections with the Order practically from the end of
April, 1943 -	He wrote to the secretary of the Math on 17-4-43, intimating amongst others his desire to take the responsibility of his own work upon himself.
March, 1944 -	As he failed to the discipline of the Order notwithstanding repeated requests the Board of Trustees passed a Resolution on 18th March 1944 as follows: "Resolved that Swami Premghananda be considered to have left the Order."
April - 1944 -	The adove was duly notified as usual in the monthly Bulletin of the Order of April 1944. Nothingfurther appears from our 'Records about him. The Ramakrishna Order ceases to have anything to do with him. I regret I cannot enlighten you further on the subject.

Sd/-Swami Gambhirananda
Assistant Secretary.

কিশোর বাংলা - ছোটদের মাসিক পত্রিকা হিসাবে 'কিশোর বাংলা' প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাসে (১৯৪১)। বাংলার শিশু ও কিশোরদের মধ্যে নবজাগরণের বাণী নিয়ে দেশ ও জাতি গঠনের নতুন দিকের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আশা করে তিনি এই আদর্শ ও শিক্ষামূলক পত্রিকা প্রকাশনায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। অল্পদিনেই পত্রিকাটির সুনাম হয়েছিল। বাংলার দুর্ভিক্ষ, দেশ বিভাগ, অর্থ সংকট প্রভৃতি ঝড়ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে প্রায় ১৩ বছর ১৩৬০ সাল (১৯৫৩) পর্যন্ত প্রকাশ ও প্রচার চলে। পত্রিকা প্রকাশের সুবিধে হবে বলে 'কিশোর বাংলা প্রেস' স্থাপনা করেন কলকাতায়।

প্রথমে কিশোর বাংলার অফিস ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি, ৮৯ আপার সারকুলার রোড, কলকাতা-৯। পরে ১৯৪৩ থেকে স্থায়ী ভাবে অফিস আসে ২৫ বলরাম দে স্ট্রীট, কলকাতা-৬। প্রেসটিও ওখানে পরিচালিত হয়। ১৯৫৩ সালের শেষে পত্রিকা ও প্রেস বন্ধ করে দেওয়া হয়। রিশড়ায় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সকল কর্ম আশা আকাংঙ্খা ওখানেই কেন্দ্রীভূত করা হয়।

কিশোর বাংলা পত্রিকা ও প্রেসের ব্যাপারে যাঁরা স্বামীজীর সহকর্মী ছিলেন এবং নানা ভাবে পত্রিকা ও প্রেসের উন্নতিতে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন - শ্রীদেবব্রত রায় চৌধুরী, শ্রীবাণী রায় চৌধুরী, শ্রীসমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, ঁত্রিভঙ্গ রায়, শ্রীবিজয় চক্রবর্তী, ঁরমানাথ মিত্র, শ্রীআভা ভট্টাচার্য, শ্রীজ্যোতির্ময় নাগ চৌধুরী, শ্রীসতী নাগ চৌধুরী, শ্রীশম্ভুনাথ মল্লিক, শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঁসুহাসিনী দেবী, শ্রীদ্বিজদাস ভট্টাচার্য, শ্রীমতিলাল মণ্ডল, শ্রীসমরাদিত্য ঘোষ, শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র, ঁদেবদাস রায়, শ্রীসুবল বিশ্বাস এবং আরো অনেকে।

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম - রিশড়ার কয়েকজন অধিবাসীর একটি আশ্রম গড়ার আমন্ত্রণে স্বামীজী প্রথমে রিশড়ায় আসেন ১৯৪৯ সালে। সেখানকার ভগ্নপ্রায় শহীদ আশ্রমে কাজ আরম্ভ করেন ১৩৫৬সালের জন্মাষ্টমীতে (১৯৪৯)। কিন্তু উক্ত আশ্রমের পরিচালকদের আচরণের ফলে তিনি তাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী দু কাঠা জমি দান সংগ্রহ করে ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে 'শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই আশ্রম 'মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম' নামে ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করা হয়।

তিনি আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন প্রথমে প্রাথমিক (পাঠশালা) হিসাবে -১৯৫২ সালের ২ জানুয়ারী। প্রাথমিক থেকে এক এক শ্রেণী বাড়িয়ে ১৯৫৬ সালে ৪ শ্রেণীর নিম্ন মাধ্যমিক রূপে পরিগণিত হয়, তিনি তখন গুরুতর অসুস্থ।

দেহত্যাগ - তিনি কঠিন উদারময় রোগে দীর্ঘকাল ভুগছিলেন। কলকাতার ট্রপিক্যাল, পি জি হাসপাতালে রেখেও রোগ নির্ণয় হয় নি। হোমিও, কবিরাজী চিকিৎসাও হয়েছিল। শয্যাশায়ী ছিলেন প্রায় ৬ মাস। ৯ বৈশাখ ১৩৬৩ সন্ধ্যা থেকে তিনি শরীরে তীব্র যন্ত্রণা ও জ্বালা অনুভব করেন। রাত ১২টার পর একটু কমে। রাত ২টার পর সেবকদের ডেকে বলেন,''তোমরা বল, হরি ওঁ রামকৃষ্ণঃ''। তিনিও বলতে বলতে পরে স্থির শান্ত হয়ে যান। এভাবে থাকার পর পরদিন ১০ বৈশাখ (২২ এপ্রিল ১৯৫৬) সকাল ৭-৪৫ মিঃ সময়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর ৮ মাস।

মাহেশ আশ্রম প্রতিষ্ঠায় যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা বিশেষ ভাবে পেয়েছেন তাঁরা হলেন; শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ ঘোষ, জ্ঞানলাল কালোয়ার, স্বামী শ্যামানন্দ, স্বামী অমিতানন্দ, প্রমোদ কুমার দে, দুর্গাদত্ত ভকত, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল চন্দ্র আওন, শীতলচন্দ্র সোম, মিহিরকুমার সুরাই, লক্ষ্মীপ্রসাদ শা প্রমুখ। যাঁরা তাঁর কর্মীরূপে এ আশ্রমে কঠোর কাজ করেছেন বা করে চলেছেন, তাঁরা হলেন; স্বামী সোমানন্দ, স্বামী শিবরামানন্দ, স্বামী দেবানন্দ, শ্রীঅরুণকুমার চক্রবর্তী, কানাই চক্রবর্তী, নিখিল পাল, সুহাসিনী দেবী ও অধরকান্তি সুর।

তাঁর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী - স্বামী প্রেমঘনানন্দ ছিলেন বিরাট কর্মীপুরুষ। বিভিন্ন কর্মে তাঁর দক্ষতা দেখলে অবাক হতে হয়। তিনি ছিলেন প্রতিভাদীপ্ত পুরুষ, নানা গুণে বিভূষিত। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ ছিল তাঁর অলংকার। তিনি শিশু ও কিশোরদের দরদী বন্ধু ছিলেন। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি, বেলুড় মঠ পরিত্যাগ ও কিশোর বাংলার প্রতিষ্ঠা ও পরে মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠার মূল প্রেরণা ছিল শিশু ও কিশোরদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলা। স্বামী বিবেকানন্দের মানুষ গড়ার শিক্ষা ও আদর্শকে তিনি এজন্য অন্যতম পাথেয় করেছিলেন। তিনি ছিলেন উত্তম সংগঠক। তাঁর সংগঠনের পরিচয় রয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শিলচর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি কেন্দ্রে এবং মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ও অন্যত্র। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকাশের জন্য

নানা পথ দেখিয়েছেন।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ ছিলেন সাহিত্যিক, সুলেখক, সুবক্তা, সংগীতজ্ঞ। তিনি এস্রাজ বাজাতেন, তবলা বাজাতেন, গান করতেন, উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর বসাতেন। তিনি শিল্পী ও দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণে দক্ষ। তিনি সুরসিক, নাট্যকার ছিলেন।

তিনি ছিলেন খেলাধূলা, ব্যায়াম ও যোগাসনের উৎসাহদাতা ও প্রচারক। গৃহনির্মাণে-টালির, বাঁশের কাজে দক্ষ। টালি ও বাঁশের পুরোনো ঘরকে ২/৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁর কাছে খেলার মত ছিল। তিনি ছিলেন ফুল বাগান চর্চায় অগ্রণী, সবজী বাগানে সফল কর্মী, রান্নায় দক্ষ, উত্তম ফটোগ্রাফার, সফল দরজী, প্রেসের কাজে সুবিজ্ঞ।

তিনি অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। গুণী ব্যক্তির সমাদর করা তাঁর বৈশিষ্ট্য। নিন্দা, সমালোচনা তিনি পরিহার করতেন। সম্ভাবনাময় যুবক ও কিশোরদের তিনি সর্বদা এগিয়ে যেতে উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন।

অতিথি-বৎসল, সাধু-প্রেমিক এই সন্ন্যাসীর জীবন ছিল অতি সরল ও উদার। নানা গুণে সমন্বিত এক মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ হলেও অতি সহজ ও সরলতা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কৃচ্ছতা ও স্বল্পে সন্তুষ্টি তাঁর জীবন-সাধনার অঙ্গ ছিল। হয়তো ঠিকমত আহার জোটে নি, কিন্তু মুখে তাঁর হাসিটি লেগে থাকত-কেউ তাঁর অনাহারের খবর জানতে পারত না।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহ - স্বামী প্রেমঘনানন্দ মহারাজ অনেক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলা নববর্ষ উৎসবের প্রবর্তকদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। এই সংঘের পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষাশিবিরে তিনি উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করতেন। 'ব্যায়াম' পত্রিকার তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কিশোর বাংলার মাধ্যমে 'কিশোর সভা' নামে একটি কিশোর সংগঠন তিনি পরিচালনা করতেন। দেহে ও মনে ছোটদের শক্তিশালীরূপে গড়ে তোলার জন্যে বাংলা ও ভারতের নানা স্থানে কিশোর সভার শাখা কেন্দ্র স্বামীজীর প্রেরণায় স্থানীয় কিশোরদের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠা হয়। স্বামীজী ছিলেন সর্বাধিনায়ক। অধিনায়ক, নায়ক, সহায়ক এভাবে এই সংগঠন পরিচালিত হত। জাতীয় খেলাধূলা, জাতীয় ভাবধারা প্রচার, সুনিয়ম শৃঙ্খলা, নৈতিক শিক্ষা, সাংস্কৃতিক আনন্দ অনুষ্ঠান প্রভৃতি এই কিশোর সভার কর্মসূচীর অঙ্গ ছিল।

মাঝে মাঝে কিশোর সভার একদিনের শিক্ষাশিবির আহ্বান করা হত। কিশোর সভার আদর্শ ও চিন্তাধারার স্থায়ী ও বাস্তব রূপ দেবার ইচ্ছায়ই মাহেশ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা।

স্বামীজী শিশু সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মকর্তাদের একজনছিলেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম কিশোর বাংলার আয়োজনে বঙ্গীয় শিশু ও কিশোর শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন ১৯৪২ সালে এলবার্ট হলে। শিশু সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগেও পরে বছর তিনেক এরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। কিশোর বাংলার পূর্বপীঠ ভারতী সাহিত্য সভার উদ্যোগে কিশোর বঙ্গ রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে ১৯৪১ সালে। ভারতী সাহিত্য সভা নিয়মিত সাহিত্য আলোচনার ব্যবস্থা ও কয়েকটি পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করে। এরূপ অনেক সংস্থা, সংগঠন স্বামী প্রেমঘনানন্দ মহারাজের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় বা সহযোগিতায় সে যুগে সমাজে স্থান রেখে গেছে।

অরূপ তোমার বাণী

সুমন চক্রবর্তী

'ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম' -
প্রভাতরবির স্নিগ্ধ কিরণ তখন আলতো চুমায়
স্পর্শ করেছে সবুজ ললাট।
সেই রক্তিম বালার্কের হৃদয় থেকে জন্ম নেন
এক যুগন্ধর।
উন্নত ললাট, আর্যকান্তি, দৃপ্ত পদছন্দ -
প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ।
মানুষ গড়ার কারিগর তিনি;
রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধানে নামেন পথে
সর্বত্যাগী।
পরমপুরুষের স্নেহাশিসে জ্যোতিষ্মান,
দু'চোখে বাংলার কিশোরের স্বপ্নময় মুখের সারি।
চলেন তিনি আপোষহীন সংগ্রামী
অজস্র বাধা-বিঘ্ন জয় করে স্বপ্নের চূড়ার দিকে।
কিশোর মনের উচ্চকিত আবেগ প্রেরণা,
হৃদয়ের স্পন্দনে নির্মাণের প্রত্যয়
সাকার হয় ক্রমে।
সময়ের সাঁকো বেয়ে,
সংগ্রাম থেকে জাগরণের তন্নিষ্ঠ পথে,
শিক্ষা আর মনুষ্যত্বের অমরলোকে
জাগে বিবেকের মহৎ বাণী,
কচিকাঁচার দল কুড়ায় মনের মুক্তা,
কিশোর বাংলা'র উদ্ভাসিত অভ্যুদয়ে।

লেখক মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানেরই শিক্ষক

।। জীবন দর্শন।।

গীতায় ভগবান বলেছেন, সতত কর্ম করতে হবে আসক্তিশূন্য হয়ে। কর্মফলে আসক্তিহীন ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে। অজ্ঞান ব্যক্তি কর্মে আসক্তি নিয়ে যেভাবে কর্ম করে, জ্ঞানীরা কর্মে আসক্ত না হয়ে লোকশিক্ষার জন্য ঠিক সেভাবে কর্ম করে থাকেন। কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদের, জ্ঞানী কখনও বুদ্ধিভেদ জন্মাবেন না। বিদ্বান ব্যক্তি যোগযুক্ত হয়ে নিজে কর্ম ক'রে অন্যকে কর্মে লিপ্ত করাবেন।

যোগস্থ কর্মী-সন্ন্যাসী স্বামী প্রেমঘনানন্দ 'যোজয়েৎ সর্ব কর্মাণি' করে সাধারণ মানুষকে কর্মে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে গেছেন । বিবেকানন্দ বলেছেন, 'এখন রজোগুণের দরকার। দেশে যে সব লোককে সত্ত্বগুণী বলে মনে করছিস, তাদের ভিতর পনের আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা।' প্রেমঘনানন্দজী এই ভাব নিয়ে প্রবল কর্ম-উদ্দীপনার স্বাক্ষর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেখে গেছেন।

যুবক, কর্মী, কিশোর, সংগঠক সকলকে তিনি সর্বদা কর্মে উৎসাহ দিতেন । সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, সমাজসেবা, ধর্ম, সংগঠন-প্রভৃতি ক্ষেত্রে সকলেই তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করত। তাঁর প্রতিভা দেখে সকলে মুগ্ধ হত, তাঁর কর্মদক্ষতা দেখে বিস্মিত হত।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিক্ষা, উদারতা, মানবিকতা, সমন্বয়বাদ ছিল তাঁর আদর্শ। বিবেকানন্দের 'প্রচুর কর্মের মধ্যে প্রভূততম প্রশান্তি'- এই ভাবাধারাকে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। বিবেকানন্দ শিক্ষা সম্বন্ধে যে অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশের কথা বলেছেন, তা গ্রহণ করে ছাত্র, কর্মী, ও কিশোরদের সেভাবে মানসিক গঠনে তৎপর ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বণ্টন করে তিনি কর্মে স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। কর্মে ভুল হলে ক্ষমা করলেও ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে কঠোর ছিলেন।

কর্মে ও ধর্মে তিনি বুদ্ধদেবের মতকেও প্রাধান্য দিতেন। 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি'–পওহারীবাবার এই কথাটি যা বিবেকানন্দ গুরুত্ব দিয়ে বলতেন, প্রেমঘনানন্দ মহারাজের সমস্ত কার্যসিদ্ধির মূলে ছিল এই আদর্শটি। বিবেকানন্দের শিক্ষা 'স্বদেশ প্রেমই ধর্ম' কথাটি ছিল তাঁর জীবন-ব্রত। জাতীয়তা বোধ বাড়ানো, স্বদেশপ্রীতির শিক্ষা দান তাঁর কিশোর বাংলা প্রতিষ্ঠার

মূলে ছিল এই ভাব। বাঙালী জাতি, বাংলা ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর গর্বের বস্তু। ছেলেমেয়েরা মনে প্রাণে বাঙালী হিসাবে গড়ে উঠুক -এ ছিল তাঁর একান্ত কামনা।

তিনি সব কাজে শৃঙ্খলার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। সুনিয়ম ও সময়ানুবর্তিতা তাঁর জীবনের একটি বড় শিক্ষা। সব জিনিস গুছিয়ে রাখা, নির্দিষ্ট স্থানে রাখা তাঁর জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম ছিল। কাজের নিয়ম সম্বন্ধে তিনি বলতেন, 'কাজটি সুন্দর হবে, তাড়াতাড়ি হবে, আর যে জন্যে করছ তার উপযোগী হবে।' আর একটি দিকে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন - কোন জিনিসের 'অপচয়, অপব্যয়, ও অপব্যবহার' যেন না হয়।

বিবেকানন্দ বলতেন, 'যদি জগতকে কোন ধর্ম শিখাইতে হয় তাহা এই অভী'। উপনিষদের এই অভী মন্ত্র প্রেমঘনানন্দজীর জীবনে পরিস্ফুট ছিল। কঠিন বিপদের বা বিরোধিতার মুখে তিনি সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেছেন। অন্যত্র যেমন তেমনি মাহেশে এই আশ্রম গড়ার মুখে প্রবল প্রতিরোধে তাঁর দৃপ্ত সাহসের পরিচয় স্থানীয় সকলেই পেয়েছেন। যত বড় কঠিন কম'ই হোক না কেন, ধৈর্য ধরে লেগে থাকলে তা সহজ হয়ে যায়- নানা বিঘ্নকুল কর্মের মধ্যে তিনি তা দেখিয়ে গেছেন।

নারীজাতির উন্নতির জন্যে তাঁর ভাবনা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীর সভ্য দেশগুলোতে যেভাবে নারীরা সমাজের সর্বস্তরে এগিয়ে চলেছে, ভারতেও একদিন তাই হবে। ভারতীয় নারীত্বের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে তারা এগিয়ে চলবে পুরুষের সঙ্গে সর্ব ক্ষেত্রে। এ জন্যে চাই শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

শিশু ও কিশোরদের ধর্মশিক্ষা সোজাসুজি দেবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। পরোক্ষভাবে গল্প বা অভিজ্ঞতার উদাহরণে ধর্মশিক্ষা দেওয়া উচিত। সৌজন্যমূলক শিক্ষা, নীতি শিক্ষা, শিষ্টাচারের শিক্ষা বাস্তব দৃষ্টিতে দেওয়াই ভাল। উপদেশের বাড়াবাড়ি কখনও তিনি পছন্দ করতেন না। তবে এ সমস্ত শিক্ষাই হবে ইতিমূলক-নেতিমূলক নয়। বড়দের ধর্ম শিক্ষা ব্যাপারে তিনি আগ্রহী ভক্তদের সঙ্গেই ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন। কোন কোন আন্তরিক ভক্তের সঙ্গে ঘণ্টায় পর ঘণ্টা ধর্মালোচনায় তাঁর কেটে যেত।

তাঁর ছিল শরণাগতির ভাব। অত্যন্ত সংকটের মধ্যে বিরুদ্ধবাদীর অযথা অন্যায় আচরণের মধ্যে তাঁকে বলতে শোনা গেছে, 'ঠাকুর, তোমার ইচ্ছাইপূর্ণ

হোক।' বিপদ এলে ধৈর্য স্থৈর্য নিয়ে তা সহ্য করতেন। দুঃখে, অভাবে, রোগে তাঁর অবিচলিত ভাব সকলকে বিস্মিত করত। সমস্ত কর্মের মধ্যে একটা অপূর্ব নির্ভরতার ভাব লক্ষ্য করা যেত। উৎসব হবে, অর্থ জিনিসপত্র বিশেষ সংগৃহীত হয় নি। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে উৎসবে মেতে গেলেন - সময়মত সব জিনিসই এসে গেল। এরূপ অনেকবার হয়েছে।

সারা জীবন তিনি কর্ম করে গেছেন। শেষের ছয় মাস শয্যাশায়ী ছিলেন, তার মধ্যে দেড় মাস হাসপাতালে। মাস তিনেক আগে কর্মীরা বলেছিল যে এইবার সব দায়িত্ব তাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক। তিনি রাজী হন নি। শুয়ে শুয়ে কাজ করিয়েছেন, সব কাজের খবরাখবর নিয়ে নির্দেশাদি দিয়েছেন। দেহত্যাগের দিন পনের আগে একজন কর্মীকে ডেকে বলেন, 'আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলুম যেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কাজ করতে পারি। তিনি আমার প্রার্থনা পূরণ করেছেন। এইবার তোমরা সব ভার নাও। আমার এবার সময় হল।'

এই সংসারের, প্রকৃতির সকল কর্মের মূলে তো শ্রীভগবান- কর্ম তাঁর, কর্মফলও তাঁর। তাঁরই কর্ম তাঁতে সমর্পণ করে প্রেমঘনানন্দজী ছিলেন নির্লিপ্ত কর্মবীর যোগী পুরুষ।

।। জীবন-স্বপ্ন ।।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ মহারাজের জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কয়েকটি বিশেষ সময়ে তাঁর জীবনে ও কর্মে মোড় ঘুরে গেছে। তাহলেও জীবনের ধ্রুবতারা স্থির লক্ষ্যে সর্বদা অচঞ্চল ছিল - সেটি হল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ।

প্রথমে ছাত্রাবস্থায় শিলচর রামকৃষ্ণ আশ্রমে আবাসিক হিসাবে তাঁর পরিচয় হয় ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাবধারার সঙ্গে। এখানেই জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য স্থির হয়ে যায়। মিশনে যোগদানের ফলে কর্মধারাও চলে মিশনের নির্দিষ্ট পথে।

এরপর যখন শ্রীগুরু মহারাজের আদেশ ও আশীর্বাদ নিয়ে ময়মনসিংহ আশ্রমে আসেন সম্ভবত ১৯৩৩-৩৪ সালে, তখন এক নতুন পথের ইঙ্গিত তাঁর মনে জেগে ওঠে। স্থানীয় ভক্তদের সন্তান একদল কিশোর ছেলেদের নিয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন তিনি - কিশোদের মধ্যে সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, অভিনয়, খেলাধূলা প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের মন ও চরিত্র গড়ে তোলার পথে এগিয়ে

দেবার চেষ্টা করেন। এখানে তাঁর আরম্ভ হয় শিশুসাহিত্য রচনা। শিশু ও কিশোর জগতে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পান তিনি।

পরাধীনতার গ্লানি তাঁর মনকে নানাভাবে বিষিয়ে তুলেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় কিশোর ও যুব মানস গঠন করার একটা প্রবল তাগিদ অনুভব করছিলেন তিনি। 'উদ্বোধন' এ থাকাকালীন ১৯৩৯ সাল থেকেই একদল কিশোর ও যুবকদের নিয়ে শুরু করলেন 'ভারতী সাহিত্য সভা'। তারই ক্রম পরিণতি 'কিশোর বাংলা' প্রকাশ ও বেলুড় মঠ পরিত্যাগ। এইখানেই জীবনের এক দারুণ ঝুঁকি এবং বড় মোড়।

১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ায় তাঁর স্বপ্ন কিছুটা সফল হল বটে, কিন্তু সভ্য স্বাধীন দেশের নাগরিকের মত সাধারণ জীবন তৈরী হয়নি। অতএব তাঁর কর্মক্ষেত্র পূর্বের মতই জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ রয়ে গেল। এমন সময় ১৯৪৯-এ রিশড়া থেকে আশ্রম গড়ার আহ্বান আসে। আবার একটি মোড়। তিনি এটিকে গ্রহণ করলেন তাঁর আদর্শের বাস্তব ও সুষ্ঠু রূপায়নের কর্মক্ষেত্ররূপে। কিন্তু আশ্রম গড়ার কঠিন পরিশ্রম, তদুপরি উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, অর্থাভাব, প্রভৃতির চাপে অপরিণত বয়সে তিনি চলে গেলেন । তবে তিনি রেখে গেছেন কিছু চিন্তা, কিছু স্বপ্ন, বলা যায় একটি বলিষ্ঠ ভিত। বর্তমান মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম তারই ওপর গড়ে উঠেছে।

তিনি তাঁর আশ্রম-কর্মীদের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন, এখানে অনেক জমি হবে, ফ্যান হবে, ফোন হবে, গাড়ী হবে। আশ্রম অনেক বড় হবে।' তিনি প্রায় সাড়ে চার বিঘা জমি রেখে গিয়েছিলেন। এখন আশ্রমের জমি প্রায় চোদ্দ বিঘা। শিল্প-শহর রিশড়ায় এখন জমি সংগ্রহ করা আর সম্ভব নয়। আশ্রম, ৫টি বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস,প্রেক্ষাগৃহ ও গ্রন্থাগারের অনেক পাকা বাড়ী হয়েছে এবং হচ্ছে। মোট সম্পত্তির পরিমাণ বর্তমান বাজারদর অনুসারে কয়েক কোটি টাকার বেশী। তিনি অসুস্থ থাকাকালীন আশ্রমে বিদুৎ ব্যবস্থা থাকলেও কোন ফ্যানের বন্দোবস্ত করা যায় নি। রোগের জ্বালায় খুব কষ্ট পেয়েছেন। পরে ফ্যান, ফোন ও স্কুলবাস হয়েছে।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ মহারাজ প্রতি বছর দীপান্বিতা কালীপূজায় নতুন প্রতিমা এনে মা কালীর পূজা করে সারা বছর মায়ের পূজার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। তখন মন্দির ছিল না- তাঁর নিজের হাতে গড়া টালির নির্মিত ঘরে পূজাদি হত।

কালীমন্দির নির্মাণ করে দেন। পরে স্থায়ীভাবে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই মন্দিরে এখন ঠাকুর ও মায়ের পূজা হচ্ছে। পরবর্তীতে শ্রী রামকৃষ্ণ মন্দিরে শ্রী ঠাকুর, মা ও স্বামীজী মহারাজের পুজো হচ্ছে।

তিনি সাধুদের সেবার জন্যে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করতেন। বর্তমানে সাধুভবন, অতিথি ভবন নির্মিত হয়েছে। তিনি ছাত্রাবাসের ছাত্রদের খাওয়া, থাকা ও দেখাশুনার ব্যবস্থার ওপর জোর দিতেন। ছাত্রাবাস তখন টালির ঘরে ছিল। এখন ছাত্রাবাস ভবন ও ভোজন কক্ষ নির্মিত হয়েছে।

তাঁর ইচ্ছা ছিল দুর্গাপূজা করার। কিন্তু কর্মীরা সাহস পায় নি বলে অগ্রসর হওয়া যায়নি। তাঁর দেহত্যাগের পরে সেই বছরে ১৩৬৩ সালে স্থানীয় ভক্তগণের চেষ্টায় আশ্রমে প্রথম দুর্গাপূজা হয়। এখন আশ্রমের দুর্গাপূজা স্থানীয় অঞ্চলে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, ঐতিহ্যবাহী দুর্গোৎসব।

তিনি দেহত্যাগের মাস খানেক পূর্বে অন্নপূর্ণা পূজার সংকল্পের কথা বলেন। সেভাবে পূজার আয়োজন চলে। তিনি শয্যাশায়ী, শরীরের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। নবনির্মিত বিদ্যালয় ভবনে প্রতিমায় পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর ঘরে ভক্ত মায়েদের কাছ থেকে তিনি সেদিন ভিক্ষা (চাউল) গ্রহণ করেন। রাত্রে কর্মীদের ডেকে বলেন, 'অল্প বয়স থেকে সারা জীবন কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে চলেছি। ভাল খাবার জোটে নি। উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে যে ক বছর ছিলুম সুখে স্বচ্ছন্দে ছিলুম বটে-তা ছাড়া সর্বত্র কষ্টেই কেটেছে। এখন আশ্রমে একটু ভাল ব্যবস্থা হয়েছে, খাবার জুটছে বটে - কিন্তু খাওয়ার ক্ষমতা নেই । মা অন্নপূর্ণার কৃপা না হলে এরূপ হয়, তাই মায়ের পূজার আয়োজন। আজ মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি-তোমাদের যেন অন্নকষ্ট না হয়।' এই পূজার ঠিক ৫ দিন পরে তাঁর দেহত্যাগ হয়।

স্বামীজীর আশীর্বাদে, মায়ের কৃপায় মাহেশ আশ্রমের কর্মীরা কোন অভাবে নেই,সুখে আছে। স্বামীজী দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে একজন কর্মীকে ডেকে ভক্তদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রণামীর মোট ২৫৬ ০০ টাকা দিয়ে বলেন, 'এই টাকা রেখে গেলুম, বই প্রকাশনার চেষ্টা করো।' বর্তমানে ৫টি পুস্তক ও বার্ষিক শারদীয় সংকলন 'নমস্তস্যৈ' প্রকাশ করা হচ্ছে। তাছাড়াও বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস থেকে পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

স্বামীজীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ করা। এজন্যে দেত্যাগের প্রায় ২ বছর আগে নির্দিষ্ট স্থানে নিজে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু এ স্বপ্ন ৩৪ বছর পরে আজও বাস্তবায়িত হয় নি। পরবর্তীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় ১১১১সালে মন্দিরের দ্বার খোলা হয়।

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

(স্বামী প্রেমঘনানন্দ মহারাজ লিখিত বিবরণ থেকে)

১৩৪৭ এর বৈশাখ পূর্ণিমার পুণ্যপ্রভাতে স্বামী প্রেমঘনানন্দ মহারাজকে পুরোবর্তী করে জন-কয়েক তরুণ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনার মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলে শ্রদ্ধাপূতচিত্তে মিলিত হয়ে এক ভবিষ্যত সংকল্প গ্রহণ করে। তাদের চোখের সামনে অন্তসাগরগামিনী বিশাল গঙ্গা আর অন্তরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের সীমাহীন রঙীন ছবি।

বিশ্বগ্রাসী সমর শুরু হয়ে গেছে। নৈতিক অধঃপতনের নগ্নরূপ তখনই দিকে দিকে ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে। ভারতের মহান অধ্যাত্ম সম্পদের উত্তরাধিকারিগণ আত্মবিস্মৃত হয়ে নানাবিধ দুর্বলতার মধ্যে অম্লানবদনে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে। যাত্রাপথের প্রথম পদক্ষেপেই তরুণ তীর্থযাত্রীদের হৃদয়ে এইসব চিত্র গভীরভাবে রেখাপাত করলে।

নিজেদের জীবন ও সমাজকে গঠন করবার ব্রত নিয়ে এই তরুণরা প্রথমেই ভারতী সাহিত্য সভা নামে একটি সভার কাজ শুরু করলেন। মনের দিক থেকে না হলে কোন পরিবর্তনই স্থায়ী হয় না। মনকে সংগঠিত করার একটি প্রধান যন্ত্র হল সাহিত্য। আর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শ ও কর্মধারাই হবে নতুন পথের একমাত্র অবলম্বন। ১৩৪৮ এর পয়লা বৈশাখ 'কিশোর বাংলা' নামে কিশোর ছেলেমেয়েদের উপযোগী একটি মাসিকপত্র প্রকাশিত হল। এই পত্রিকাটির মাধ্যমে কিশোর সভা নামে কিশোর সংগঠনের কাজ শুরু হল। সংগঠন ও আদর্শ প্রচারের সুবিধার্থে ১৩৫০ সালে কিশোর বাংলা প্রেস নামে একটি ছাপাখানার পত্তন হয় এবং কলকাতা, ২৫ বলরাম দে স্ট্রীটে অফিস স্থাপিত হয় । ১৩৫৬ সালের প্রথম ভাগে রিশড়া পৌরসভার অন্তর্গত মৌজা মাহেশে দু বিঘা জমি শহীদ আশ্রম নামক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কিশোর সভার নামে বার্ষিক ১ টাকা খাজনায় বন্দোবস্ত পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে শ্যামবাজার নিবাসী স্বর্গীয় প্রমোদ চন্দ্র দে মশাই কয়েক কাঠা জমি দান করেন। অনেক আশা আকাঙ্খা নিয়ে যে আশ্রম প্রস্তুতির কাজ কর্মীরা শুরু করেছিলেন, ৯ বৎসর পর তার একটা বাস্তব রূপ দেবার সুযোগ উপস্থিত হল। ১৩৫৭ সালে সমগ্র প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করে নাম দেওয়া হয় 'মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম' এবং একটি শক্তিমান পরিচালক সভার ওপর সমুদয় দায়িত্ব ও কর্মভার অর্পণ করা হয়। এইভাবে কলকাতা কেন্দ্রটিকে গুটিয়ে মাহেশে আশ্রমের সর্বাঙ্গীন কাজের ভেতর দিয়ে মূল আদর্শকে রূপায়িত করার কাজে অগ্রসর হওয়া গেল। ১৩৫৮ সালের প্রথমার্ধে ১৮৬০ সালের ভারতীয় ২১ আইন অনুসারে আশ্রমটি রেজেষ্ট্রী করা হয়।

আশ্রম পরিচালিত বর্তমান দ্বাদশ প্রতিষ্ঠান সমূহ (২০২৪)

(১) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত)	ছাত্রসংখ্যা	৯৬২
(২) বিবেকানন্দ বিদ্যালয় (পঞ্চম থেকে দশম)	ছাত্রসংখ্যা	৩২৪
(৩) নিম্ন বুনিয়াদী, দুই ইউনিট (প্রথম থেকে পঞ্চম)	ছাত্রসংখ্যা	৩৮৮
(৪) পাঠশালা বিদ্যালয় (প্রথম থেকে চতুর্থ)	ছাত্রসংখ্যা	২২২
(৫) শিশুভবন (নার্শারী কিণ্ডারগার্টেন)	ছাত্রসংখ্যা	১২৩
	মোট ছাত্রসংখ্যা	২০১৯

(৬) ছাত্রাবাস (পঞ্চম থেকে দশম), ছাত্রসংখ্যা ১১৫

(৭) গ্রন্থাগার (সর্বসাধারণের) - পুস্তক সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। মহারাজের নিজস্ব সংগ্রহের প্রায় চার শত পুস্তক নিয়ে এই গ্রন্থাগারের শুরু।

উচ্চ ও মাধ্যমিকের ফলাফল স্থানীয় অঞ্চলে সর্বশ্রেষ্ঠ। আশ্রমের সমস্ত বিদ্যালয়ই পড়াশুনার নিয়ম শৃঙ্খলায় বৈশিষ্ট্য ও সুনাম অর্জন করেছে।

অন্যান্য নিয়মিত কার্যাবলী

(১) একটি হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়- রোগীর সংখ্যা বৎসরে গড়ে প্রায় ১০,০০০।

(২) প্রকাশনা বিভাগ

(৩) কিশোর বাংলা প্রেস-একটি ট্রেডল মেসিনসহ ছোট ছাপাখানা

(৪) স্কুলবাস ও রিক্সা

(৫) গোসেবা - ৪/৫টি গরু পালিত হচ্ছে।

(৬) বাগান ও পুকুর-ফুলবাগান ও ছোট সবজী বাগান এবং ৩টি ছোট পুকুর।

(৭) বস্ত্রবিতরণ।

এ ছাড়া আশ্রমে প্রতি বছরে দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, সরস্বতী পূজা, রটন্তী কালীপূজা, ফলহারিণী কালীপূজা, শিবরাত্রি, প্রতিষ্ঠাতা মহারাজের জন্মোৎসব এবং ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জন্মতিথি পূজা ও উৎসব পালিত হয়। বাংলা নববর্ষ উৎসব, রবীন্দ্র জয়ন্তী,নেতাজী জন্মোৎসব, যুবদিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিদ্যালয় সমূহের পুরস্কার বিতরণী উৎসব প্রতি বৎসরই আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ মহারাজ রচিত
পুস্তকাবলী

১। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কর্তৃক প্রকাশিত - (ছোটদের জন্যে)
ক) উদ্বোধন-**রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প**
খ) দেওঘর বিদ্যাপীঠ- বিবেকানন্দের কথা গল্প (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)

২। উদ্বোধনে সহ সম্পাদক থাকাকালীন 'বাংলা বানান পদ্ধতি' নিয়ে একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন, উদ্বোধনে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়েছিল, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি।

৩। কলকাতার প্রখ্যাত প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড প্রাঃ কোঃ লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত ছোটদের পুস্তকসমূহ-
ক) **উপনিষদের গল্প** (ছাপা নেই)
খ) **রামকৃষ্ণের গল্প** (ছাপা নেই)
গ) **জ্যান্ত ভূতের দল** (কিশোর উপন্যাস) (ছাপা নেই)
ঘ) **অজানার পথে** (কিশোর উপন্যাস) (ছাপা নেই)

৪। কিশোর বাংলা (ভারতী সাহিত্য সভা) থেকে প্রকাশিত পুস্তক -
ক) **শরত জীবনী** (ছাপা নেই)
খ) **ইংলিশে বাংলায় লড়াই** (ছাপা নেই)
৫। এম. সি .সরকার এণ্ড সন্স লিঃ থেকে প্রকাশিত-
ক) **নরনারায়ণ** (ছোটদের নাটক, বর্তমানে ছাপা নেই)
৬। মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত ছোটদের পুস্তাকাবলী -
ক) **মনের ব্যায়াম** (বর্তমান সংস্করণ) মূল্য ১০০ টাকা
খ) **শিকাগোয় বিবেকানন্দ** (ছাপা নেই)
গ) **পিউ পিয়া** (উদ্বোধন থেকে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ), বর্তমান সংস্করণ মূল্য ৭৫ টাকা
ঘ) **ছড়া ও গল্প** (ছাপা নেই)।

৭। অপ্রকাশিত পুস্তকাবলী -
ক) গীতার শিক্ষা (বড়দের জন্যে)
খ) নারদীয় ভক্তিসূত্র (বড়দের জন্যে)
গ) সুন্দর হতে চাও (ছোটদের জন্যে)
৮। বাংলার কিশোর কিশোরীদের জন্যে আদর্শ ও শিক্ষামূলক মাসিক পত্রিকা।

'কিশোর বাংলা'

স্বামী প্রেমঘনানন্দ মহারাজের সম্পাদনার ১৩৪৮ থেকে ১৩৫৯ পর্যন্ত, প্রায় বার বছর প্রকাশিত হয়েছিল।
বর্তমানে প্রতি বৎসরে 'শারদীয় সংকলন' হিসাবে 'কিশোর বাংলা' পূর্বের ঐতিহ্য নিয়ে মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করছেন।

স্বামী প্রেমঘনানন্দজীর ছদ্মনাম

কিশোর বাংলায় ব্যবহার করেছেন-**অরূপ**।
'অরূপ' নামটি বাংলার কিশোর কিশোরীদের বিশেষ প্রিয় নাম।
শিশু-সাহিত্যিক মহলেও এই নামে তিনি বেশী পরিচিত ছিলেন।

শিবদাস, অমিতাভ দত্ত- এই দুটি নামও কোন কোন বই ও গল্প কবিতায় ব্যবহার করেছেন।

যে ব্যক্তি সদা সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, সেই জানতে পারে তার স্বরূপ কি। সে ব্যক্তিই জানে যে, ঈশ্বর নানারূপে দেখা দেন। নানাভাবে দেখা দেন।

● শ্রীরামকৃষ্ণের অমিয়বাণী

সাধন মানে - তাঁর পাদপদ্ম সর্বদা মনে রেখে, তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা। যে যত বেশি সাধন -ভজন করবে সে তত শীগগীর দর্শন পাবে।

● শ্রীমা সারদাদেবীর অমিয়বাণী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আদর্শের মঙ্গল প্রদীপ

'অরূপের' স্বভাবের মধ্যে এমন একটা সহজ সারল্য এবং বজ্রের কাঠিন্য একাধারে বিরাজ করত যে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারি নি।" এমন মধুর স্বভাব আমি জীবনে কম লোকেরই দেখেছি। মুখে একটা অম্লান হাসি সব সময়ই লেগে থাকতো। অথচ লক্ষ্য করে দেখেছি;আদর্শের একটি মঙ্গল-প্রদীপ সব সময় তাঁর অন্তরে প্রজ্জলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন - 'অন্তর প্রদীপখানি'।

সংগঠনের কাজে অরূপের এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে, কোন শক্ত কাজকে তিনি দুঃসাধ্য বলে মনে করতেন না। আর অবলীলাক্রমে সেটা তিনি সম্পন্ন করতে পারতেন। বহুবার বহু ঘটনায় আমরা তাঁর কর্মপন্থা দেখে বিস্মিত হয়েছি এবং মনে মনে তাঁর প্রশংসা করেছি।

কিশোর বাংলা ১৩৮০
(শারদীয় সংকলন থেকে)

অখিল নিয়োগী
(স্বপনবুড়ো)

'অরূপ'-রতন

বাংলা ভাষাকে কী করে সকল রকমের কাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় যায়, কী করে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, কী করে তা সর্বভারতে ইংরেজীর আসন অধিকার করতে পারে-এটি ছিল তাঁর জীবনের অন্যান্য কর্তব্য-ব্রতের মধ্যে অন্যতম। শিশু ও কিশোরদের মনেও যে শিল্প-চেতনা আছে, তারাও যে আঁকতে পারে, আপন মনে এবং শিল্পও গড়ে আর সেই সুন্দর সম্পদ সাজিয়ে যে অভিনব প্রদর্শনী হতে পারে, এ চিন্তা সেদিন কারো মাথায় এসেছিল? তার প্রকাশ কোথাও ঘটেছিল-এমন নিদর্শন কোথাও দেখা যায় নি। কোলকাতার 'অ্যালবার্ট হল'-এ প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে এখন যে মস্ত ইমারতটায় বড় বড় বইএর দোকান ও কফি হাউস'-তারই ওপরতলায় 'শিশু শিল্প প্রদর্শনী' করেন অরূপ- সে এক অপরূপের সমাবেশ। তার উদ্বোধক ছিলেন প্রবীণ চিত্রশিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। সুতরাং আজকের দিনের 'শিশু চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা' ও 'শিশু-চিত্র প্রদর্শনীর' পথপ্রদর্শক সেই সংসার-বিরাগী, শিশু কিশোর প্রেমিক মানুষটিই নয় কি?

কিশোর বাংলা ১৩৮৪
(শারদীয় সংকলন থেকে)

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
(বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক)

অরূপের সান্নিধ্যে

জীবনে চলার পথে আমরা নানা মানুষের সংস্পর্শে আসি। তাঁদের মধ্যে সকলেই আমাদের মনে রেখাপাত করেন না। কিন্তু দু চারজন এমন মানুষ থাকেন, যাঁদের সান্নিধ্যে এসে আমরা আকৃষ্ট হই এবং যারা আমাদের জীবন গঠনের সহায়তা করেন। আমার জীবনে এমনই একজন মানুষ ছিলেন অরূপ।

'কিশোর বাংলা' ছোটদের মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি -কিশোর ছেলেমেয়েদের শরীর, মন ও চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে ঐ পত্রিকা মারফত 'কিশোর সভা' নামে একটি সংগঠনও গড়ে তোলেন। ঐ সংগঠনের তিনি 'সর্বাধিনায়ক' এবং সংগঠকের দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। অবিভক্ত বাংলার নানাস্থানে এবং বাংলার বাইরেও কিশোর সভার শাখা স্থাপিত হয়। কিশোর বাংলার মাধ্যমে এক প্রতিশ্রুতিময় তরুণ লেখক গোষ্ঠীও গড়ে ওঠে।

বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও অরূপের সান্নিধ্যে এসে ব্যক্তিগত জীবনে আমি কতখানি সফল হতে পেরেছি জানি না। কিন্তু তাঁদের সান্নিধ্যে না এলে আমার জীবনধারা যে গতানুগতিক অন্য খাতে বইত, সে কথা আজ অকপটে বলতে পারি।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(কিশোর বাংলার কর্মী, কিশোর কল্যাণ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ)

অরূপের স্বপ্ন

সবুজ স্বপ্ন ছিল তোমার চোখে;
গড়ে তুলবে এ-বাংলার
একগুচ্ছ ফুলের কুঁড়ির মত
কিশোর-কিশোরীকে
যারা ফুটে ওঠবে তারুণ্যে ভরপুর
সজীব লাবণ্যে পূর্ণ,
আনবে নতুন প্রাণের জোয়ার
ভেসে যাবে সব জীর্ণ সংস্কার,
দেখা দেবে নতুন সূর্য,
নতুন যুগের আলোয়
উদ্ভাসিত হবে সোনার বাংলা ।

সেই স্বপ্ন, সেই ব্রত,
সেই আশা নিয়ে
আজো চলেছে তোমার অনুগামীরা-
ক্লৈব্য-দীনতার পঙ্ক থেকে
তারা ফোটাবেই
সার্থকতার পঙ্কজ ।

করবী ভট্টাচার্য

(কিশোর বাংলার প্রাক্তন লেখিকা)

নূতন দিশারী

দেশের মেরুদণ্ড কিশোর কিশোরীর দল। তাদের সংগঠিত করতে হবে, পরিচালিত করতে হবে ঠিক পথে। ময়মনসিংহ আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হল প্রথম দল, সঙ্গে হাতে লেখা পত্রিকা 'ছাত্রবান্ধব'। তারপর অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ আর নিষ্ঠার ফসল 'কিশোর বাংলা' মাসিক পত্রিকা আর দিকে দিকে 'কিশোর সভা' কিশোর সংগঠন। এই সভার প্রতিষ্ঠিত নানা গ্রামীন কেন্দ্র থেকে এবং পত্রিকা মারফৎ বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আওয়াজ উঠলো- 'বাংলা লেখ, বাংলা শেখ, বাংলা বল।' ব্যায়ামাগার, গ্রন্থাগারও গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে। থামেন নি সন্ন্যাসী- নিবেদিত প্রাণ। সেই নিবেদনেরই ফল মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম।

আশ্রমে ঢুকতে গেলেই যেন দেখতে পাই-সদা হাস্যময় এক সৈনিক সন্ন্যাসী। পরনে গেরুয়া বাস, হাতে গৈরিক পতাকা। সে পতাকার মাঝখানে হালুম রাজা। সুন্দর বনের বাঘ লাফাচ্ছে। চঞ্চল বাতাসে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে সে পতাকা। তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর পায়ে পা মিলিয়ে হাজার হাজার বাংলার কিশোর কিশোরী জীবনোল্লাসে হাসতে হাসতে এগিয়ে চলেছে। আকাশে নবোদিত সূর্য। অরূপ;স্বামী প্রেমঘনানন্দ সঙ্গী সাথীদের নিয়ে চলেছেন নবোদিত সূর্যের দিকে। গড়ার কাজ শুরু হয়েছিল ময়মনসিংহে অর্থাৎ যে বীজ বোনা হয়েছিল সে বীজে হয়েছিল অমৃত বৃক্ষ। তার শেকড় চলতে চলতে এসেছে মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে। আর, তা ফুলে ফুলে অপূর্ব শোভা নিয়ে বলছে, তুমি আছ, তুমি আছ। আমাদেরই অন্তরে-বাহিরে।

বিমল দাস, মাহেশ

(অরূপের অনুরক্ত ভক্ত ও কিশোর বাংলার লেখক)

আমাদের দাদা অরূপ

অরূপ ছিলেন আমার দাদা। আমার শ্বাশুড়ীকে মা ডাকতেন। সে ডাক মুখের ডাক মাত্রই ছিল না। মাকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন ভালবাসতেন তেমনি আবদারও করতেন তাঁর কাছে। তখন আমাদের খুবই দুর্দিন। টাকা পয়সা নাই। প্রেস কেনা হবে, মা বললেন, 'অরূপ, অত ভাবছ কেন? আমার যা আছে তা যত সামান্যই হোক তা নাও, কিছুটা তো সাহায্য হবে।' মায়ের আশীর্বাদ বলে মাকে প্রণাম করে গ্রহণ করলেন। রাত দুপুরে ২৫ নং বলরাম দে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে প্রেস এলো। সে দিন আমাদের সকলের কী আনন্দ। প্রেসের প্রথম কর্মী ও তাঁর

সহকারী আমাকেই করলেন। কত কাজই না করিয়েছেন আমাদের দিয়ে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজটি করে গেছে নিঁখুতভাবে ভালবেসে, আনন্দে। রেডিওতে আমাকে দিয়ে গান করিয়েছেন। দাদাই ছিলেন আমাদের মধ্যমণি। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও দেখেছি তাঁর মুখে হাসি। কতটুকুই বা জানি। তাঁর স্মৃতির সঙ্গে মাঝে মাঝে মনে পড়ছে কবি সুনির্মলবাবু, রমানাথবাবু, ত্রিভঙ্গবাবু, সমরবাবু, বিমলবাবু, বিজয়, বেনু, নির্মল ভাই আরও অনেকের কথা। তাদের অনেকেই আজও তাদের বাণীদিকে ভোলে নি। দাদার স্নেহ ভালবাসা তো ভুলবার নয়।

বাণী রায়চৌধুরী
সোদপুর

অরূপের কতরূপ

আমাদের অরূপ স্বামী প্রেমঘনানন্দজী কতরূপেই না প্রকাশমান, তার প্রভাব আজও চলছে চলবে। তাঁরই জন্যে আমরা কত বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের কত কবি সুধী জ্ঞানীগুণীদের সান্নিধ্যে এসেছি। স্বামীজীর কৃপায় আমরা দর্শন পেলাম বিদ্রোহী কবি নজরুল আর তাঁর স্ত্রী প্রমিলা দেবীর। শ্রদ্ধা জানালাম, ধন্য হলাম।

আমরা কিশোর সভার ছেলেমেয়েরা স্বামীজীর সঙ্গে দু'বার বরানগরে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর জন্মদিনে প্রণাম করতে পেরে কি যে আনন্দ-অনুপ্রেরণা পেয়েছি তা প্রকাশ করতে পারব না।

অরূপের উৎসাহে উদীপ্ত হয়ে আমরা সুভাষ কিশোর সভার ছেলে মেয়েরা কখনো-সখনো ছুটির দিনে এখানে সেখানে বেড়িয়ে আসতাম। যেতাম দক্ষিণেশ্বরে, বেলুড়ে। রিশড়ায় আজ যেখানে স্বামী প্রেমঘনানন্দজী প্রতিষ্ঠিত মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আর আশ্রম পরিচালিত পাঁচটি বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, সেখানেই বছরে একদিনের জন্য কিশোর সভার শিবির হত। সকাল থেকে সন্ধ্যে চলত শিবির। নানা শাখার ছেলেমেয়েরাও যোগ দিত। আনন্দঘন পরিবেশ। অরূপের আহ্বানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ হত শিবিরে।

স্বামীজী শুধু উপদেশ দিতেন না। হাতে কলমে কাজ করতেন, তাঁর কর্ম ধারা, আচরণ, দাগ কেটে বসে যেত। বাংলা ভাষাকে ভালবাসতে তিনিই শিখিয়েছেন। আদেশে নয় ভালবাসায়। আমরা মুগ্ধ হয়েছি-অন্তরে গাঁথা আছে সেদিনের চয়ন। আজ বুঝতে পারছি এ মানসিকতা কোথায় পেয়েছিলাম? নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি-সেই মহান মানুষ গড়ার কারিগর স্বামী প্রেমঘনানন্দের অনুগ্রহেরই-সান্নিধ্যে।

সমরাদিত্য ঘোষ, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

সার্থকনামা প্রেমঘনানন্দ

স্বামী প্রেমঘনান্দ মহারাজ কার্যিত মানব-জমিন নিয়েই জন্মেছিলেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁর জীবনে ত্যাগ বৈরাগ্য ও মনীষা আবির্ভূত হয়েছিল। তাঁর ত্যাগ বৈরাগ্য ছিল মানুষকে কাছে টেনে নেওয়ার। তাঁর আকর্ষণী মন্ত্রে ছিল মানব প্রেম-তাই তিনি সার্থকনামা প্রেমঘনানন্দ।

কাছাড় জেলার শিলচর শহরে এক দ্বিতল বাটির নীচের তলায় একটি নাতি পরিসর কক্ষে রামকৃষ্ণ আশ্রমের কেন্দ্র ছিল। স্বামীজী অচিরেই শিলচরে বিশালায়তন একখণ্ড জমি সংগ্রহ করে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের পত্তন করেন। সৌম্যদর্শন সদা প্রফুল্ল, শিশুর মত সরল এই স্বামীজী শহরের শিশু থেকে বৃদ্ধবৃদ্ধা পর্যন্ত সকলকেই আকৃষ্ট করেছিলেন। কারণ তিনি সকলকে সমানভাবে ভালবাসতেন। অনেক পরে উদ্বোধনে একদিন দেখা হবার পর বুঝলুম-রুটিন মাফিক সাধুগিরিতে তাঁর অরুচি। তিনি তাঁর স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বাধীনভাবে বিকশিত করতে চান। মুক্তপুরুষ বৈরাগ্যের বন্ধনের ভেতরে সংকুচিত হয়ে থাকতে চান না। একদিন শীতের ভোরে আমাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে এসে পঞ্চবটীতে বসে তিনি তাঁরপরিকল্পনার কথা বললেন, একটি সংঘ গড়ে তোলা হবে-তাঁর কাজ হবে মানুষ গড়া। বাংলার ছেলেমেয়েদের রয়েল বেংগল টাইগারের মত তেজস্বী করে তোলা চাই। এজন্যে চাই একটি পত্রিকার যার ভেতর থেকে বাংলার তরুণ-তরুণীরা পাবে আত্মগঠনের খোরাক।

তার পরের ঘটনা-অনুগামীদের নিয়ে তিনি এ বিষয়ে কয়েকটি বৈঠক করলেন। যুদ্ধের ডামাডোলে কাগজ বের করা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিল ।

দেখা দিল। কয়েকজন কর্মীর আগ্রহে শেষে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মাত্র ১২০ টাকা মূলধন নিয়ে ভরা বিশ্বযুদ্ধের মাঝে কিশোর বাংলা জন্মগ্রহণ করে। স্বামী প্রেমঘনানন্দ তাঁর অপরিসীম কর্ম দক্ষতা, সংগঠন ক্ষমতা, অটুট ধৈর্য ও সংকল্পের জোরে সকল রকম বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করে কিশোর বাংলার গতি অপ্রতিহত রাখেন।

কিশোর বাংলা শারদীয় সংকলন
(১৩৮২ থেকে গৃহীত)

সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য
(কিশোর বাংলার প্রথম সম্পাদক, সাংবাদিক)

মনের মানুষ

সহজ সরল মানুষটি। চুপচাপ থাকেন, ধীর স্থির শান্ত সংযত। কাছে এলে মনে হয় এই তো আমার মনের মানুষ। তাঁর কথা ও সংস্পর্শ দেয় প্রাণের আরাম, মনে

আনন্দ। শিশুর মত সরল, কী প্রাণখোলা হাসি। যেমন হাসতে জানেন, তেমনি হাসাতেও জানেন। অথচ কাজ ছাড়া একদণ্ডও থাকতে পারেন না। এমন একজন গোটা পুরো মানুষ চোখে খুব পড়ে না।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী। মঠ ও মিশনের প্রায় সকলেই তাঁকে ভালবাসেন। মিশনের কাজকর্ম, সেবা নিখুঁতভাবে করেন। একদিন চলে এলেন মঠ ছেড়ে আর ফিরলেন না।

তিনি বেরিয়ে এলেন-কিশোর বাংলা, কিশোর সভা, ভারতী সাহিত্য সভা,গানবাজনা, শারীর চর্চা, সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে কিশোর মনকে জাগিয়ে তোলার ব্রত নিয়ে। শিশুকাল থেকে একটি বলিষ্ঠ ভাব, মহৎ চিন্তা, চিত্ত নিবেশের অভ্যাস জাগিয়ে তুলে শিশু ও কিশোদের জীবনের বুনিয়াদ পাকাপোক্ত ভাবে গড়ে তুলতে হবে। এই তাঁর কর্ম এই তাঁর আশা আকাঙ্খা, এই তাঁর সাধনা।

সকলেই চলেছে অমৃতের পথে। যার যা প্রকৃতি সে সেইভাবে সেই ভাবময় পুরুষকে গ্রহণ করেছে। সকলেই সেই পরমপুরুষের ভাবসন্তান ।

ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর সকল সন্তানদের চরণে প্রণাম।

দেবব্রত রায়চৌধুরী

(কিশোর বাংলার প্রথম যুগের সহকর্মী, সাংবাদিক, সাহিত্যসেবী)

একটি প্রণাম

মাঝে মাঝে আমরা বাগবাজারে মায়ের বাড়ি যেতাম। মায়ের মন্দিরে প্রণাম করে উদ্বোধনের দোতলার মধ্যের ঘরেও যেতাম। মেঝেয় পাটি পাতা, তার ওপরে বসে স্বামী প্রেমঘনানন্দ সামনে ছোট ডেস্কের ওপর রেখে উদ্বোধনের প্রুফ দেখছেন। হাসিমুখে স্নেহপূর্ণ স্বরে কথা বলতেন। মহাপুরুষ মহারাজের কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের কথা বলতেন সহজ সরলভাবে আমাদের মনে গেঁথে গেঁথে। সাংসারিক রীতি নিয়মগুলি শেখাতেন-কীভাবে বিছানা পাতবে, নিখুঁতভাবে ঘর ঝাঁটই বা কীভাবে দিতে হয়, লেবু কেটে বীজ ফেলে দিয়ে পাতে দিতে হয়, যে কাউকেই খেতে দেবার সময় ভাববে ঠাকুরকে ভোগ দিচ্ছি ইত্যাদি।

সকল মানুষকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আত্মজ্ঞান চিন্তার অধিকারী দেখতে চাইতেন। নির্ভীক আর নির্লোভ চরিত্রই তার প্রথম সোপান। সকলের ভাল করা, সকলের জীবনকে জাগিয়ে তোলা তাঁর আনন্দের উৎস ছিল।

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী তিনি সর্বগুণেরও আধার, ঈশ্বরে সমর্পিত জীবন, সম্পূর্ণ

নিরহংকারী অথচ প্রতিটি পদক্ষেপও ছিল সুসংবদ্ধ ছন্দময়, সকল কাজে শিল্পকুশলতা। প্রণাম।

আভা ভট্টাচার্য, কৃষ্ণনগর
(অনুরক্ত ভক্ত ও কিশোর বাংলার কর্মী)

মানুষ গড়ার কারিগর

'ছোটদের নিয়ে শুরু হবে আমার কাজ। যদি দেশপ্রেম, সততা, পবিত্রতা আত্মবিশ্বাস, কর্মের প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে নতুন বাংলা স্বাধীন ভারত এরাই গড়ে তুলবে অদূর ভবিষ্যতে। স্বামীজী যে বলে গেছেন মানুষ গড়তে।'

মানুষ গড়ার কারিগর প্রেমঘনানন্দজী মহারাজ এই বলে তরুণদের ডাক দিয়েছেন প্রকৃত 'মানহুঁস' হয়ে ওঠার জন্য। আর শিশুদের গল্প শুনিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের, স্বামীজীর, উপনিষদের। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে এই আশ্চর্য সাধুর কথা শুনে অবাক হয়েছিলুম। তিনি জীবন দিয়ে, কথা ও কাজ দিয়ে শিশু ও কিশোরদের দেহ প্রাণ মন সুসংগঠিত করার জন্য গঠন করলেন কিশোর সভা। তরুণদের কিশোরদের নিয়ে বাংলার ও ভারতের সর্বকালীন মন্ত্র ঘোষণার জন্য প্রকাশিত হল কিশোর বাংলা।

কঠিন বিষয়কে সহজ করে বলার ছিল তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা। প্রেসের কাজ, সাহিত্য রচনা, ছবি আঁকা থেকে চাষবাস ফুলবাগান করা, ঘরামীর কাজ করা, পাকা রাধুনীর কাজ পর্যন্ত জানতেন। এসরাজ, তবলা বাজাতে পারতেন। তাঁর জাতীয়তাবাদী বাঙালিয়ানার, স্বদেশীয়ানার আহ্বানে ও আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ, নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসব সমিতি, সারা বাংলা রবীন্দ্রোৎসব সমিতি আরও অনেকে, অনেক সংঘ ও প্রতিষ্ঠান।

পরিচয়ের প্রথম দিনে আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলুম শূন্য হাতে-আজ দেখি আমার বুক ভরে আছে তাঁর অহৈতুকী স্নেহ ভালবাসার পারাপারহীন আনন্দে।

বিমল বসু
(সাংবাদিক, সুলেখক, সমাজসেবী)

প্রেমঘন আনন্দময়

হিমাংশুশেখর চক্রবর্তী,
এলাহাবাদ

আঁখি ঝরে। কেন জান প্রভু?
পেয়েও পাই নি। তাইতো।
তুমি প্রেম ঘন আনন্দময়
শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে।
মাহেশের ধূলি ধন্য করেছ
এ সুখের বাড়া নাইতো,
এই ধূলি মেখে দুঃখী পায় ত্রাণ
তব পুত-গাঁথা স্মরণে।

হে মহান

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক, আশ্রম বিদ্যালয়

শিশুদের ভালবেসে গড়লে এ নিকেতন
অরূপ তোমার আনন্দ
তাই তো রয়েছ জেগে স্মৃতিমাঝে অনুক্ষণ
প্রণমি প্রেমঘনানন্দ।
কিশোর কিশোরী মাঝে
তোমার মন্ত্র বাজে
সদাই বিরাজে পদছন্দ।
মাগি তব আশীর্বাদ
চরণেতে প্রণিপাত
হে মহান প্রেমঘনানন্দ !

স্বামী প্রেমঘনানন্দের কয়েকটি কথা

আমরা চাই - শরীরের শক্তি, মনের বিদ্যার চরিত্রের শক্তি, ধনের একতার ও জনের শক্তি। সমগ্র জাতিকে শক্তিমান করবার পথ তোমরা খুঁজে বার কর আর যে সব নিয়ম আচার ও কুসংস্কার জাতিকে দুর্বল করছে সেগুলোকে জোর করে বিদেয় কর।

অন্তত জনা কয়েক অগ্রগামী ত্যাগী ও শক্তিমান ছেলে ও মেয়ের এখন দরকার, যারা বজ্রের মত শক্ত হয়ে সমাজের আবশ্যক সংস্কার করবে, যারা করবে এই দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের গোড়া পত্তন।

তোমরা অদৃষ্ট বা ভগবানের দয়ার ওপর নির্ভর না করে আত্মশক্তির ওপর নির্ভর করো। নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করো। জাতীয় খেলাধূলা গ্রহণ ও প্রচার করো। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে নিজে শক্তিমান ও উন্নত হওয়া যায়।

ভগবানকে ডাক আর না ডাক আত্মবিশ্বাসী পরিশ্রমী লোককেই তিনি সাহায্য করেন। অকর্মা কুঁড়ের বাদশারা সারা অঙ্গে ভগবানের নামের ছাপ এঁকে বেড়ালেও তিনি তাঁদের দিকে ফিরে তাকান না।

শ্রদ্ধাতে মানুষ বড় হয়, আর অনুকরণে মানুষ হয় জড়। হীন ও দুর্বলরাই পরের অনুকরণ করে। সবলরা শ্রদ্ধা নিয়ে পরের গুণগুলো নিজের মাঝে নেয় ও হজম করে।

অক্ষমকে স্বাবলম্বী হবার জন্যে সাহায্য করো, তাকে ভিক্ষা দিয়ে আরও অক্ষম করে তুলো না। ভিক্ষা দাও কিন্তু ভিক্ষুক তৈরী করো না।

কিশোর বাংলার আদর্শ-'শক্তি, সংস্কার ও স্বাধীনতা'। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্ট থেকে কিশোর বাংলার আদর্শ গ্রহণ করা হল- 'শক্তি, সংস্কার ও জাতীয়তা'।

কাজের তিনটি জিনিস-কাজটি সুন্দর হবে, তাড়াতাড়ি হবে এবং যে জন্যে কাজ, তার উপযুক্ত হবে।

কোন জিনিসের অপচয়, অপব্যয় বা অপব্যবহার না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মনকে সর্বদা সচেতন রাখতে হবে। মন যেন কোনভাবে নিস্তেজ হয়ে না পড়ে। সর্বদা কর্মে তৎপর থেকে, খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ্য রেখে, উৎকণ্ঠের চিন্তা রেখে মনকে সদা-সচেতনতার মধ্যে রাখা প্রয়োজন।

প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তিকে ও প্রতিষ্ঠানকেই কতকগুলো বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে হয়। প্রতিষ্ঠানের ভালর জন্যই এগুলো আসে। মুখের কথাতেই কেউ ভাল হয় না, কেউ খারাপও হয় না। কাজেই ভাল হয় বা মন্দ হয়। এই কাজের সত্যিকার বিচার হয় দীর্ঘকালের ফলাফল দেখে।

নিন্দেকারী কখনও মনে শান্তি পায় না। নিন্দুক নিজের মনকে বাঁধতে পারেনা- অপরের নিন্দে করে চলে। এরা অত্যন্ত দুর্বল মনের লোক। এদের মত দুর্ভাগ্যপৃথিবীতে আর কারও নেই।

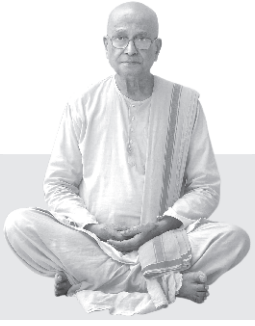

দুঃখ তোমার আশিস হরি
যাতনা তব সান্ত্বনা
সংশয় আগুন জ্বালিয়ে হৃদে
পরখ কর খাঁটি সোনা ।

সংকলন ও সম্পাদনা
স্বামী সোমানন্দ
সম্পাদক, মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম মঠ

‘একটি ইচ্ছা রূপ নিল এ জগতে’ — স্বামী সোমানন্দ

‘একটা বিষয়ে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আজ প্রায় ষাট বছরের এই আশ্রমের কর্মকান্ডের দিকে লক্ষ্য করে আমরা বলতে পারি— এই ষাট বছরে কীভাবে যে কী হয়েছে ভাবলে অবাক হতে হয়। যেখানে স্বামী প্রেমঘনানন্দ মহারাজ নিঃসম্বল অবস্থায় এখানে এসেছিলেন সেখানে তাঁর সময় থেকেই মাত্র দু’কাঠা জমি থেকে তিনি সাড়ে চার বিঘার জমি বন্দোবস্ত করে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। আশ্রম বিদ্যালয়ের একটি বড়ো পাকা হল ঘর তাঁর সময়ে নির্মিত হতে পেরেছিল। আজ তাঁর আশীর্বাদে শ্রীশ্রী ঠাকুরের কৃপায় বিরাট সম্পদ, বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠেছে । তাঁর আকাঙ্ক্ষিত আশ্রমে একটি ‘ শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির’ নির্মিত হয়েছে । এ আশ্রমে ‘সারদা মন্ডপের’ সমাপ্তির ভেতর দিয়ে আমরা শ্রীশ্রী ঠাকুরের কৃপা -করুণার কথাই অনুভব করি । তাঁর শরণাগত হয়ে থাকার যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি , তার কিছু কিছু সুফল পেয়ে আমরাও অবাক হয়েছি। শ্রীশ্রী ঠাকুর , মা ও স্বামীজীর কৃপা আমাদের জীবনকে সার্থক করে তুলুক এই প্রার্থনা তাঁদের চরণে’। একদিন এক ভক্ত মহারাজের কাছে জানতে চেয়েছিলেন তিনি কেন শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির আগে নির্মাণ না করে স্বামী প্রেমঘনানন্দ স্মৃতি মন্দির আগে নির্মাণ করেছেন। এই প্রশ্নের উত্তরে গুরুভক্তির এক চূড়ান্ত দিক জনমানসে উন্মোচিত হয়। তিনি বলেন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীশ্রী ঠাকুরের মন্দির একদিন নির্মিত হবেই। কিন্তু জাগতিক নিয়মে পরবর্তী অনুগামীরা তাঁর গুরুদেবের তথা আশ্রম প্রতিষ্ঠাতার মন্দির নির্মাণে বিশেষ আগ্রহী নাও হতে পারে। তাই তিনি নিজহাতে সেই কাজ সুসম্পন্ন করে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণে ব্রতী হন। এই ঘটনায় গুরুর প্রতি শিষ্যের অটল ভক্তি , কর্তব্যবোধ ও তা বাস্তবায়নের শিক্ষা পরিস্ফুট হয়। ‘একটি ইচ্ছা রূপ নিল এ জগতে’ প্রবন্ধে স্বামী সোমানন্দ শুরুতেই একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধটি তিনি লিখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা মহোৎসব স্মারিকা ‘আনন্দে’। ‘তিনি বলেছিলেন সে কথাটি - চমকে ওঠার মতো কথা। পাশ থেকে শুনেছিল একটি ভক্ত। বলেছিলেন আশ্রমের ঘাস ভরা মাঠে দাঁড়িয়ে কয়েকজন কর্মী ভক্তের কাছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে । মনে কেমন একটি দৃঢ় প্রত্যয় ছিল তাঁর কথার মধ্যে। বলেছিলেন, ঠাকুরকে এখানে ঘোরা ফেরা করতে দেখেছি, এই ঘাসের ওপর বেড়াচ্ছেন’। এখানে ‘তিনি’ হলেন স্বামী প্রেমঘনানন্দ আর শ্রোতা ভক্তটি হলেন স্বামী সোমানন্দ। ‘এখানে’ বলতে বর্তমানে নির্মিত মন্দির স্থলে । সেখানে তিনি আরো উল্লেখ করেছেন - ‘ এখানেই ঠাকুর বসবেন - তিনি কাজ দেখবেন, অন্তর দেখবেন, আর দেখবেন শ্রদ্ধা। দেখবেন উদ্দেশ্য রূপায়ণে অপরিসীম পরিশ্রম, এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর। নিত্যপূজা করার সময় নেই সন্ন্যাসীর বা কর্মীভক্তদের। কিন্তু অন্তর্যামী মন দেখেন। আন্তরিকতা দেখেন। এই ভরসা আর অন্তরের আকুলতা দিয়েই তিনি ঠাকুরকে বসাবেন আশ্রমের হৃদয় মন্দিরে’। স্বামী সোমানন্দের কথায়, যখনই আর্থিক সমস্যা এসেছে, নির্মাণ কাজের জটিলতায় ভাবনা চিন্তা এসেছে, তখনই অনুভব করা গেছে তার আশ্চর্য সমাধান। প্রভুর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুতেই তা সম্ভব হতো না। তখন মনে হতো ঠাকুরের কাজ ঠাকুরই করিয়ে নিচ্ছেন। এই মন্দির নির্মাণে ঈশ্বর নির্ভরতার শিক্ষা ভক্ত ও কর্মী - সকলে যথাযথভাবে পেয়েছে সন্দেহ নেই।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ স্মৃতি ভবন

উদ্বোধন

ঝুলন পূর্ণিমা, ১ভাদ্র, বৃহস্পতিবার ১৩৯৬

(১৭ আগস্ট ১৯৮৯)